ছেলেবেলা

নীল মুখার্জি

যে কোনো ছেলেই তার 'ছেলে' বেলায় এই কথাটা শুনে থাকে 'শোন, মেয়ে হলে বুঝতিস'। এই কথাটা নিঃসন্দেহে আমার শোনা প্রথম সেক্সিস্ট স্টেটমেন্ট। তখন এসব বুঝতাম না। তখন মেয়েদের একটা আলাদা প্রজাতির প্রাণী মনে হত। কত রঙিন, দলবদ্ধ হয়ে থাকে, কী সব গুন গুন কথা বলে, কত গোপনীয়তা, কত রহস্য তাদের ঘিরে। আমি বয়েজ স্কুলে পড়েছি, স্কুল জীবনের একদম শেষের দিকে প্রথম কয়েক ফুটের টেবিল ডিসটান্সে মেয়ে দেখি, টিউশন পড়তে গিয়ে। ওদের আলাদা ঘর, আমাদের আলাদা ঘর, মাঝখানে স্যার। ওই ঘরটা আলো হয়ে থাকত, কী সুন্দর গন্ধ আসত। আমরাও টুকটাক একটু উঁকিঝুঁকি মারতাম। কারুরই সেভাবে নাম জানতাম না। ওই স্যার ডাকলে বা নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকির সময় যেটুকু জানা যেত কয়েকজনের। শীতকালে পিকনিকের সময়েও একটা অদ্ভুত লিঙ্গ বৈষম্য। 'এই পিছনে গিয়ে বস, সামনে ওদের বসতে দে', 'যা তোরা মাঠে খেল, ওদের দিকটায় ছেড়ে দে'। রাগ হত, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র এই জন্যই যে, ওদের থেকে আমাদের কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে দূরে রাখা হত। সত্যি বলতে দেখতে কে সুন্দরী, কার নিটোল গড়ন, এসব ভাবনা মাথায় আসার বয়সে পৌঁছইনি তখনও। আমারতো যত আগ্রহ ছিল ওদের সেই বিচিত্র পৃথিবীটাকে ঘিরে, যেখানে ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি কোনো মেয়ে ডেকে কথা বলত, তাহলে তো খাতিরই বেড়ে যেত—'কী বলল রে?'। শুধু কি বাইরে, বাড়িতেও মা-দিদি প্রায়ই চাপা গলায় কী সব বলত। ওদিকটায় গেলেই 'বুট্টু, ওঘরে যাও, বড়োদের কথা শুনতে নেই।' বড়োদের কথা হওয়া সত্ত্বেও বাবা-মা এর নিজেদের কথাগুলো বেশ জোরেই শুনতে পেতাম। যাই হোক কারোর সঙ্গে পরে আর এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখিনি, এসব শুধু মফস্বলেরই হয় কিনা। আরও কয়েক বছর পিছিয়ে যাই। আমি আমার ঠাকুমাকে দিদা বলে ডাকতাম। আমার দিদার বিয়ে হয় স্বাধীনতার বছর খানেক আগে। দিদার পুরো মেয়েবেলা দিল্লি আর পাঞ্জাবে (যা বর্তমানে পাক অন্তর্ভুক্ত) কেটেছে। তাঁর মতো মহিলার অ্যাডোলেসেন্টের একদম শুরুতেই বিয়ে করে সিউড়ির মতো বীরভূমের একটা তস্য মফস্‌সলে চলে আসাটা মোটেও সহজ ছিল না। ভীষণ কম কথা বলতেন, যে কয়টি বলতেন বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই শুনত। প্রতিটা সাংসারিক প্রশ্নচিহ্নে আমার মায়েদের মতো লোকাল বউমার কাছে তাঁর ইতিহাস ও উদাহরণই শেষ কথা।

আমার জন্মানোর পর আমার ভালো নামটি রাখে দাদু। আর বাড়ির প্রথম পুত্র সন্তান হিসেবে আমার কয়েকশ নামের মধ্যে দিদার দেওয়া 'বুট্টু' নামটাই সার্বভৌমত্ব পায়। সব

পরিবারের মতো আমার বাড়িতেও একটা নিঃশব্দ রাজনৈতিক মেরুকরণ ছিল। আমার মামার বাড়ি থেকে আমার ডাকনাম রাখা হয় অর্ক। আমি নাকি আমায় অর্ক বলে ডাকলেই প্যান্ট খুলে 'ওই'টা দেখাতাম। একটা সময়ের পর খুব জরুরি ভেবেই অর্ক নামে ডাকা বন্ধ হয়ে যায়। আমার সত্যি মনে নেই, আমায় সেটা কে শিখিয়েছিল। আমি আমার মায়ের মাকে 'সেহাড়াপাড়ার দিদা' বলে ডাকতাম। আমার মামার বাড়ি সেহাড়াপাড়ায় বলে। সেই ইকুয়েশনে দিদাকে কখনো 'ডাঙ্গালপাড়ার দিদা' বলিনি। খুব একটা মামার বাড়ি ঘেঁষা ছিলাম না বলে আমার প্রায় পুরো ছোটোবেলাটাই ডাঙ্গালপাড়ায় কেটেছে। আমার স্কুল, খেলার মাঠ, বন্ধু, টিউশন, দাঁত তুলতে যাওয়া, মেয়েদের স্কুল সবই একদম বাড়ির কাছেই।

ডাঙ্গালপাড়া বেশ বড়ো একটা পাড়া। সাতখানা কালীপুজো আর শহরের সবচেয়ে বড়ো দুর্গাপুজো করা ক্লাবদের দৌলতে পাড়ায় প্রচুর মানুষ থাকত সারাবছর। আমি সাতটায় উঠতাম, পড়তে বসতাম, হরলিক্স খেয়ে ছোটো সাইকেল চালিয়ে নিজেই স্কুলে যেতাম ক্লাস টু থেকে। স্কুল থেকে এসে দেখতাম, স্কুল যাওয়া কাকে বলে। ধবধবে সাদা স্কার্ট, কেডস, মাথায় নীল রিবন, মোটা ব্যাগ, টেবিলে গরম টিফিন, উঁচু সাইকেল—আমার দিদি—ডে সেকশনে। দিদি আমার থেকে অনেক বড়ো। সন্ধ্যে হলে দিদি প্রায় দরজা বন্ধ করে পড়ত। মাঝে মাঝে মা খাবার দিতে গেলে যখন দরজা খুলত, আমিও ঢুকে পড়তাম। গোটা খাট জুড়ে মোটা মোটা বইখাতা ছড়িয়ে আছে। কোথাও একটা পেনের ঢাকনা খোলা, কোথাও খাতা খুলে উলটো করে রাখা। তার মাঝে দিদি অন্যদিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমিও দিদির দেখাদেখি আমার সমস্ত পাতলা বইগুলোকে গোটা খাটে ছড়িয়ে একমাত্র পেনের ঢাকনা খুলে, পেন্সিল নিয়ে পড়তে বসতাম। পরের দিকে দিদি আমায় আর ঢুকতে দিত না, বেরোতে চাইতাম না বলে। দিদির জীবন সম্পর্কে আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। কখনো কখনো সেই দরজার নীচে দিয়ে দিদিকে নাচতে দেখতাম। অন্যমনস্ক হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে, নিজের সাথে হেসে হেসে কথা বলতে দেখতাম। দিদির প্রতি আমার দুটো প্রকট হিংসের মধ্যে একটা ছিল দিদির দরজা বন্ধ থাকত, আর বইয়ের তাকে দিদির বইগুলো বেশ দাঁড়িয়ে থাকত, আর আমার লম্বা চটি বইগুলো ঠিক দাঁড়াতে পারত না বলে শুয়ে থাকত।

আমার বাইরের জগত বলতে ওই বাড়ির কাছাকাছি গোটা তিনেক মাঠ। এর থেকে বেশি শহরটাকে আমি চিনতাম না। বেশ ভয়ও করত—দূরে গেলেই হারিয়ে যাব, মা মারবে, হাই রোডে গেলেই গাড়ি চাপা পড়ব, মা মারবে। খেলে ফিরতে একটু অন্ধকার হলেই মা মারাত্মক একটা মুখ বানিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকত। আর গোটা পাড়া চাউর হয়ে যেত "বুট্টু তোর মা তোকে খুঁজছে"। আমার দাদুর দৌলতে বাড়িতে ছেলেমেয়ে পেটানোর খুব একটা চল ছিল না। দাদুর দাদু ঠিক জমিদার না হলেও বেশ খানদানি ধনী ব্যক্তি ছিলেন। সেই কারণে আমার বাড়িতে দিদা বেঁচে থাকা অবধি একটা অন্যরকম অনুশাসন ছিল। দিদা

মাঝে মাঝে আমায় আদর করে বলত, "মনে রাখবে, তুমি প্রিন্স, সব ছেলেরা তোমায় হিংসে করে।" যেটার মানে দাঁড়াত হয়তো—তুমি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। বলতে নেই, যে সে কথাটা আমি কখনোই শুনিনি। ধনী পূর্বপুরুষওয়ালা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাবার ছেলে হিসেবে ওটাই আমার প্রথম ডিক্লাস্‌ড্ হওয়া। বড়োদের কথা না শোনার যেমন একটা ভালো দিক হল, নিজের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তৈরি হওয়া, তেমনই একটা আপাত খারাপ দিক হল, একটু বেঁড়েপাকা হয়ে যাওয়া। মানে না বুঝে নতুন শেখা কয়েকটা খিস্তি রাগের মাথায় মাকে বলে প্রায় খেলতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল কয়েকবার। পরে অবশ্য মানেগুলো জেনে সেটার সঠিক প্রয়োগ ও টার্গেট অডিয়েন্স ঠিক করে ফেলি, বেশ অল্প বয়সেই।

আমার বাড়িতে কোনো কালেই কেউ বিশেষ সিগারেট বা মদ খায়নি। আমার পাশের বাড়ির জেঠুকেই সিগারেট খেতে দেখেছি। জ্যেঠু ডাক্তার ছিলেন, গাড়ি নিয়ে বেরোলেই পাশের সিটে চেপে বসতাম। জেঠুকে আমি জেঠু বলেই ডাকতাম। জ্যেঠিমাকে আজও জেঠিমাই বলি। দাদু মারা যাবার বছর খানেক পর থেকে জেঠুর বাড়ি আমাদের ল্যান্ডমার্ক হয়ে যায়, রিক্সাওয়ালাদের বোঝানোর জন্য। একবার দাদুর দেওয়াল আলমারিতে একটা গোটা সিগারেটের প্যাকেট পেয়ে, বাথরুমে গিয়ে সেটা জ্বালাই, খেয়েও ছিলাম হয়তো সামান্য। খুব পোড়া পোড়া গন্ধ হয়ে যাওয়ায়, আমি প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফিনাইল, বডি স্প্রে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করি। তখন আমি ক্লাস থ্রি। আর সেটাই আমার প্রথম নিজের হাতে বাথরুম পরিষ্কার করা।

আমার মার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে। মা স্কুলে অ্যাথলেটিক ছিল এবং ভালো গান গাইত। বিয়ের পর পুরোটাই রান্নাঘরে হারিয়ে যায়। নিজের 'না পাওয়া' গুলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিয়ে পূরণ করাটা তখন বেশ প্রচলিত। সেই কারণেই আমার দিদি ভীষণ ভালো গান গাইত। আর আমি আঁকার মাস্টার, তবলার মাস্টার, আবৃত্তির মাস্টার করে বেড়াতাম। সারা বছরে তিরিশখানি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বাম আমলে কিউবা, ইরান এসব দেশের কীসব কারণে আরও গোটা দশেক এক্সট্রা প্রতিযোগিতা হত। তাতে আমরা দু-ভাইবোন চলে যেতাম। আমার মেজমাসির মেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চা করত। সে আর আমার দিদি পালা করে প্রথম দ্বিতীয় হত। আর আমি কখনোই খুব ট্যালেন্টেড চিত্রশিল্পী, তবলচি বা আবৃত্তিকার হয়ে উঠতে পারিনি। তবে আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসতাম। স্ট্রিক্টলি গল্পের বই। শুধু ছোটোদের রামায়ণ আর কমিক্স না, প্রায় সব রকম। তবে বাবার কাছে যে সব বই থাকত, সেগুলো নাকি বড়োদের, তাই বাবার অসংখ্য ক্লাসি বইয়ের ফাঁকে আমার রংচঙে বইগুলোর একটা জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। আমার সম বা বিষম বয়সি কোনো বন্ধুদের কারোরই সেরকম গল্পের বই পড়ার ঝোঁক ছিল না, শুধু

একটি দাদার ছাড়া। সেই দাদা আমার দিদির থেকে একটু ছোটো হবে। পাড়ার ছেলে, বিকেলে ক্রিকেট খেলতাম, সেই সূত্রে সেই দাদার বাড়ি প্রায়ই যেতাম। বাড়িতে একটা বড়ো বাগান, তাতে ট্যাঙ্ক ভর্তি রঙিন মাছ, খরগোশ আর একটা ঘর, সেটা জুড়ে শুধু টিনটিন, কাকাবাবু, টেনিদা, জুলে ভার্ন, শিব্রাম, সঞ্জীব, সত্যজিৎ। সব ফুল সেট। ওই ঘরটায় বসে অর্ধেক গরমের ছুটি কাটিয়েছি। একদিন দাদা সেই 'একটা বড়োদের বই দ্যাখ" বলে ঘুলঘুলি থেকে নামিয়ে একটা ছোট্ট বই দেখাল। অবাক হয়ে দেখলাম। প্রতি পাতায় বিদেশি মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। তখনও ফোরে উঠিনি, আর এত বড়ো মেয়েরা যে জামা কাপড় না পরে ছবি তুলতে পারে, কিছুতেই বিশ্বাস করিনি। আমি বেশ কয়েক বছর এটাই ভেবেছি, ওটা বোধহয় বিশেষ কোনো ড্রেস, নইলে এরকম হতেই পারে না। একদিন দুপুরে ওই দাদা আমায় বোঝাল, আমাদের হিসি করার জায়গাটার আরও ফাংশন আছে। আমায় দিয়ে সেটা দেখানোর প্রস্তাব দিল। আমি জন্ম লাজুক। কোনোদিন জ্ঞানত মা-বাবার সামনে চান করিনি। কিন্তু বিনিময়ে 'যে কোনো বই' পাওয়ার লোভে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমাদের দাদা-ভাই সম্পর্কটা আমূল বদলে গেল। আমার অল্পবয়স বা জরুরি হরমোনগুলো না থাকায় বা হয়তো ইচ্ছে না থাকায়, আমার শরীরে কোনো নতুন অনুভূতি আমি পাইনি। দিনের পর দিন বই আনতে যেতাম। একদিন তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে বই আনতে যাওয়া শেষ হল। তারপর মাঠ বদলালাম। সেই দাদার সঙ্গে পরে আমার বয়সি আরেক বন্ধুকে দেখতাম মাঝে মাঝে।

স্কুলে আমি বরাবর মাঝের সারির ছেলে ছিলাম। লেখাপড়ায় স্কুলে আমার বিশেষ খ্যাতি ছিল না। প্রতিদিন ছুটির ঘণ্টা বাজতেই গেটের বাইরে একটা বইয়ের গুমটিতে গিয়ে বসে থাকতাম। গুমটির মালিক তপনমামা আমার মামার বাড়ির পাড়ার লোক। আমায় ভাগ্নে ডাকত আর অবাধে তার দোকানের সব জিনিসে আমায় হাত দিতে দিত। ক্লাস ফাইভে উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পে যেতাম, ক্রিকেট ক্যাম্প। সিউড়ি শহরে ক্যাম্প বলতে লোকে ক্রিকেট ক্যাম্পই বোঝে। স্কুল বা পাড়ার মাঠে ক্যাম্পের ছেলেদের একটা আলাদা ডিমান্ড ছিল। ক্রিকেট কিট বা ডিউস ব্যাট কিনে দেওয়ার মতো টাকা আমার বাবা খুব স্বচ্ছন্দে বার করতে পারত না। তাও মা একদিন আমায় সেখানে ভর্তি করে দিয়ে এল। এই ক্লাস ফাইভেই আন্ডার-১৩ সাবডিভিশন খেলতে প্রথম আমি শহরের বাইরে যাই। মজাটা হল সেটাই আমার প্রথম কলকাতা আসা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে মিনিট খানেক হাওড়া ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আমার সেই ক্যালেন্ডার আর বইয়ের মলাটে দেখা হাওড়া ব্রিজ। পরে ব্রুকলিন ব্রিজ দেখেও সেই অনুভূতি আর কখনো হয়নি। এক কম্পার্টমেন্ট বন্ধু নিয়ে সল্টলেক স্টেডিয়ামে উঠলাম। উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, সেন্ট্রাল, মধ্যমগ্রাম ঘুরে ঘুরে ৫ দিন খেলেছি। আমাদের বাড়িতে তখন ল্যান্ড

ফোন আসেনি। আমি একবারই ফোন করেছিলাম জ্যেঠিমার বাড়ি। মা ছুট্টে এসে ফোন ধরেছিল। দূর থেকে মায়ের গলা খুব আলাদা লেগেছিল শুনতে। নিজেকে খুব 'বড়ো হয়ে গেছি' মনে হয়েছিল।

দিদি প্রেম করে বিয়ে করে কলেজের একদম শুরুর দিকে। দিদিকে দিদিভাই বলে ডাকি বলে জামাইবাবুকে দাদাভাই বলে ডাকা শুরু করি। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই টাটুন জন্মায়, আর আমার দিদা মারা যায়। তখন আমার শরীর ,মন, হরমোন সবের দরজা খুলে গেছে। গালে ব্রণ, হাতে ফিজিক্স, বুকে আর পাশের সাইকেলে বান্ধবী। দিদা মারা যাবার পর থেকে মা আবার গান শুরু করে। আমার সচেতন হয়ে ওঠা আর দিদির পোস্ট ম্যারিটাল লাইফ সেটল হওয়ার পর মায়ের জীবন অনেকটা বদলে যায়। বাবাও রিটায়ারমেন্টের পর একদম নিজের জগতে হারিয়ে যায়। সারাদিন সারারাত টেবিলে বসে পড়াশোনা আর লেখালেখিতে ডুবে থাকত। আমার বেশ আগ্রহ হত, কী লেখে বাবা। সত্যি বলছি, কিছুই বুঝতে পারিনি। যেন বাংলা সাহিত্যের কিছু খাপছাড়া ইতিহাস। আমিও লিখি, ওই বাবার ক্লাসি কিছু লেখার মাঝে মাঝে রংচঙে আমার লেখা।

আজ আমার বইয়ের তাকে বইগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক বই, ওই দাদার থেকে অনেক বেশি। আজ নিজের অজান্তেই গোটা খাটে আমার কাগজপত্র, বই ছড়িয়ে থাকে। আমার দরজা বন্ধ থাকে। আমি বাড়িতেই সিগারেট খাই। আমি জানি মেয়েরা কী গল্প করে। আমি জানি মা দিদিকে চাপা গলায় কী নিয়ে কথা বলত। এখন বিদেশিনীর নগ্ন ছবি দেখে একঘেয়ে লাগে, আর অনেক সময়ে মায়ের সামনেই নোংরা গাল দিয়ে দি। তবু কোথাও যেন ছেলেবেলাটা ওই হাওড়া ব্রিজটায় আটকে গেছে। ব্রিজের এপারটা থেকেই এখন উড়ে যাই অন্য রাজ্যে, অন্য দেশে, ওপারটায় আর সেভাবে যাওয়া হয় না। তবু যত বার গেছি, আন্ডার-১৩ এর ছেলেটাকে অবাক হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি।